HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০১ হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন
টপিক ০২: তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)
টপিক ০৩: নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)
টপিক ০৪: নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)
টপিক ০৫: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
টপিক ০৬: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)
টপিক ০৭: হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)
টপিক ০৮: মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)
টপিক ০৯: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)
টপিক ১০: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন

ব্রিটিশ ভারতে উনবিংশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজে কয়েকজন ধর্মীয় সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি স্থানীয় অত্যাচারী জমিদার, নীলকর এবং ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালান। এরপর মুসলমান সমাজের অনেকেই পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এর প্রসারে প্রচেষ্টা চালান। বাঙালি রাজনীতিবিদগণ প্রথমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক ও পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হন। তাঁরা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ। সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জনগণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন

ক. হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী (Life Sketch of Haji Shariatullah) :

হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ১৭৮১ সালে ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি চিন্তাশীল, মনোযোগী ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি মক্কা শরীফে যান এবং দীর্ঘ কুড়ি বছরের মতো সময় সেখানে অবস্থান করে ইসলামী শিক্ষা আয়ত্ত করেন। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে তিনি ওয়াহাবি আন্দোলনের সাথে পরিচিত হন এবং এ আন্দোলনের দ্বারা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হন। ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি বিখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদ শাহ্ ওয়ালীউল্ল্যা ও বিপ্লবী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারের কাজে নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করেন। ১৮৪০ সালে এ মহৎপ্রাণ ও ধার্মিক নেতা মৃত্যুবরণ করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন

খ. ফারায়েজী আন্দোলন (Faraidi Movement): ওয়াহাবি মতাদর্শে বিশ্বাসী হাজী শরীয়তুল্লাহ্ পরিচালিত আন্দোলনের নাম 'ফারায়েজী আন্দোলন'। 'ফারায়েজী' শব্দটি এসেছে 'ফরজ' শব্দ থেকে। 'ফরজ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অবশ্য পালনীয়।' তিনি তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত হয়ে মুসলমানদের 'ফরজ' অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালনে আহ্বান জানান। কেননা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ লক্ষ্য করেন যে, মুসলমান জনগণ পীরপূজা, পীরের দরগায় ওরশ, মানত পালন এবং কবর পূজায় লিপ্ত। মুসলমানদের এসব ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনাচার এবং নৈতিক অধঃপতন হাজী শরীয়তুল্লাহকে বিচলিত করে তোলে। তিনি এসব পালনের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি মুসলমানদেরকে পাঁচটি ফরজ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। এজন্যই তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের নাম 'ফারায়েজী আন্দোলন।' ফারায়েজী আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় আবরণে একটি সংস্কার আন্দোলন।

ওয়াহাবি আদর্শে বিশ্বাসী হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ছিলেন ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিদেশি ও বিধর্মী ইংরেজ রাজত্বে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব নয়। ব্রিটিশ ভারতকে তিনি এজন্যই 'দারুল হারব' বা 'বিধর্মীর রাজ্য' বলে ঘোষণা করেন। তিনি মনে করেন যে, এরূপ বিধর্মী শাসিত দেশে মুসলমানদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশাসন ঠিকমত পালন করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের জুমআ ও ঈদের নামাজ বর্জনের নির্দেশ দেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন

হাজী শরীয়তুল্লাহ্র আহ্বানে ফরিদপুর ও তার আশেপাশের কারিগর, কৃষক, তাঁতি, জেলে সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। তিনি লক্ষ করেন যে, এসব নিম্নবিত্তের মানুষদের উপর অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর ইংরেজ সাহেবরা নির্যাতন ও শোষণ চালাচ্ছে। কাজেই তিনি এ শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। ফলে তিনি ধর্মীয় নেতা হলেও তাঁর উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্তায়। তিনি জনগণকে জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। কিন্তু শক্তিশালী জমিদার ও নীলকরদের প্রবল আক্রমণের মুখে হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ফারায়েজী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন

গ. ফারায়েজী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব (Reaction and Impact of Faraidi Movement): ফারায়েজী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলন তৎকালীন অখণ্ড বাংলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ফারায়েজী আন্দোলনের প্রভাব ছিল নিম্নরূপ:

১. সচেতনতা বৃদ্ধি : এ আন্দোলনের ফলে বাংলার মুসলমান জনগণ নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

২. আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশুদ্ধির প্রেরণা: তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশুদ্ধির প্রেরণা জেগে ওঠে। তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও স্থবির চিন্তাধারার মধ্যে গতিশীল বিপ্লবী চেতনা জন্মলাভ করে।

৩. অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি: হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন বাংলাকে স্বাধীন বা মুক্ত করতে ব্যর্থ হলেও তা মুসলমান জনগণকে অধিকার সচেতন করে তোলে।

৪. জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ও সোচ্চার হবার প্রেরণা: মুসলমান সম্প্রদায় অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর বণিকদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিতভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

৫. যুক্তিবাদী ও প্রতিবাদী হতে প্রেরণা প্রদান: ফারায়েজী আন্দোলন মুসলমান জনগণের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার দূর করতে এবং তাদেরকে যুক্তিবাদী ও প্রতিবাদী হতে সাহায্য করে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও ফারায়েজী আন্দোলন

৬. রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা: হাজী শরিয়তুল্লাহ্র মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মওলানা মোহাম্মদ মোহসেন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া পিতার অসমাপ্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফারায়েজী আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। ১৮৬২ সালে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুদু মিয়া পিতার মতই ফারায়েজী আন্দোলনে যোগ্য নেতৃত্ব দেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্র ফারায়েজী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তিনি ধর্মসংস্কারে অনেকটা সফল হন। তিনি অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নবিত্ত মুসলমান জনগণকে অধিকার সচেতন করে তোলেন এবং তাদেরকে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী হবার চেতনা সৃষ্টি করেন। ফারায়েজী আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০২ তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

টপিক ০২: তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

ক. তিতুমীরের জীবনী (Life Sketch of Shahid Titumir): বীর যোদ্ধা, বিপ্লবী নেতা ও সফল সংগঠক সৈয়দ মীর নিসার আলী ওরফে 'তিতুমীর' ১৭৮৬ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিতুমীর স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। তিনি ছিলেন কোরআনে হাফেজ এবং বাংলা, আরবি ও ফার্সি ভাষায় দক্ষ। ধর্মশাস্ত্রে, ধর্মীয় দর্শনে তিনি ছিলেন অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষ করা যায়। ছোটবেলায় তিতুমীর দেখতে সুদর্শন ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় পাঠশালার শিক্ষকগণ তিতুমীরের সাহস, তীক্ষ্ণ মেধা ও স্মরণশক্তি দেখে আশ্চর্য হতেন। কুস্তী, অস্ত্রচালনা, সাহসিকতা প্রভৃতির জন্য ছোটবেলাতেই তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এজন্য তিনি অল্প বয়সেই নদীয়ার জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর অধিনায়ক পদ লাভ করেন।

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

১৮২১ সালে তিতুমীর হজ্ব করার জন্য মক্কা যান। সেখানে তিনি তিন বছর অবস্থান করেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি উত্তর-ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভীর সাথে পরিচিত হন। তিনি ওয়াহাবি বিপ্লবী ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ হন। দেশে ফিরে এসে তিনি প্রথমে নীলকর ইংরেজ বণিক এবং সামন্ত রাজা-জমিদারদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে গরিব চাষিদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা চালান। শীঘ্রই তিনি ইংরেজ শাসকদের রোষানলে পতিত হন। দেশের মাটি থেকে বিদেশি ইংরেজ শাসনকে উৎখাত করার জন্য তিতুমীর সবশেষে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৮৩১ সালে তিনি যুদ্ধে শহীদ হন।

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

খ. সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় সংস্কারের পদক্ষেপ (Step towards Social and Religious Reforms): তিতুমীর ছিলেন মনে-প্রাণে ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ভারতে তথা তদানীন্তন বাংলাদেশে প্রথমাবস্থায় ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল সংস্কারবাদী আন্দোলন। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচারগুলো দূর করতে সচেষ্ট হন। ওয়াহাবি আদর্শে বিশ্বাসী তিতুমীর পীরপূজা, কবরপূজা, মানা-মানত প্রভৃতি দূর করে প্রকৃত বা মূল ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নির্দেশ পালনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিতুমীর বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে না পারলে অবহেলিত মুসলমান সমাজ উন্নতি লাভকরতে পারবে না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় মূল অনুশাসনের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করা।

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

গ. নীলকর বণিক ও সামন্ত জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'দশসালা' জমিদারি বন্দোবস্ত এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন বাংলার মুসলমানরা। কেননা, কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন পাস করে এদেশের সমস্ত নিষ্কর জমিজমা নিজ অধিকারে নিয়ে তা আবার তাদের আশীর্বাদপুষ্ট নতুন জমিদারদের মধ্যে নিলামে বন্দোবস্ত দিয়েছিল।

তিতুমীর বুঝতে পেরেছিলেন যে, নীলকর বণিক এবং এদেশীয় সামন্ত রাজা-জমিদারদের হাত থেকে গরিব কৃষকদেরকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সংগঠন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য। এজন্য তিনি চব্বিশ পরগণা এবং নদীয়া জেলার কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হন। কৃষক-মুক্তির আন্দোলনে তিতুমীরকে প্রথমে বাধা প্রদান করেন চব্বিশ পরগণা জেলার খানপুরের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। কৃষ্ণদেব রায় অন্যান্য জমিদারদের সংগঠিত করে তিতুমীরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তৎপর হন। তিতুমীরের এক হাজার সশস্ত্র শিষ্য-সাগরেদ সর্বপ্রথম খানপুরের অত্যাচারী জমিদারের বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে জয়যুক্ত হয়। এরপর তাঁর বিজয়ী বাহিনী ইছামতী নদী অতিক্রম করে পুঁড়ার জমিদার বাড়ি আক্রমণ করে।

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

তিতুমীরকে গ্রেপ্তার করার জন্য বারাসাতের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কালবিলম্ব না করে কদমগাছিয়া থানার দারোগার নেতৃত্বে দেড়শ সিপাই ও অসংখ্য চৌকিদার দফাদার পাঠান। দুই পক্ষের প্রচণ্ড সংঘর্ষে দারোগা ও কয়েকজন বরকন্দাজ যুদ্ধে প্রাণ হারান। যুদ্ধে তিতুমীর জয়লাভ করে দুই জমিদারের তালুক দখল করেন। তিতুমীর এরপর টাকী এবং গোবরডাঙ্গার অত্যাচারী জমিদারদেরকেও কর প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিতুমীরের বিজয়ে নীলকর বণিক এবং স্থানীয় জমিদারগণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। খানপুরের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, তারাগনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, নাসরপুরের জমিদার গৌরপ্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ জমিদার এবং ডেভিস সাহেবসহ অন্যান্য নীলকর ইংরেজ বণিকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে তিতুমীরের বাহিনীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। তিতুমীরের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার। কিন্তু আলেকজান্ডারের নেতৃত্বাধীন এ যৌথ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। নীলকর ইংরেজ বণিক, স্থানীয় জমিদার এবং সরকারি বাহিনীর মিলিত শক্তির পরাজয় তিতুমীরকে আরও সাহসী এবং স্বাধীনচেতা করে তোলে।

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

ঘ. বারাসাত বিদ্রোহ (Barasat Mutiny): তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন প্রথমে ছিল অত্যাচারী নীলকর বণিক এবং স্থানীয় সামন্ত রাজা-জমিদারদের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন। কিন্তু বার বার তিতুমীরের নিকট পরাজিত হয়ে স্থানীয় জমিদার এবং নীলকর ইংরেজ বণিকগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তিতুমীরের এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো স্বাধীনতা অর্জন। তিতুমীর ইংরেজ সরকারের নিকট বহুবার জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার তিতুমীরের বক্তব্যে কর্ণপাত করেনি। বাধ্য হয়ে তিতুমীর নিজ বাহিনীকে সংগঠিত করে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৮২৫ সালে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ সংযুক্ত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে তিনি মনোনিবেশ করেন। উইলিয়াম হান্টারের মতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত প্রায় ৮৩ হাজার কৃষক-সেনাকে নিয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "তিতুমীর এখন এদেশের নবাব। দেশের সকল প্রজাই স্বাধীন। কৃষকরাই এ দেশের জমির মালিক। আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন মানি না।" তিতুমীরের এ বিদ্রোহই ইতিহাসে 'বারাসাত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ বিদ্রোহ দমনের জন্য "হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নীতির" কৌশলও অবলম্বন করেন। তাঁরা প্রচার করেন যে, তিতুমীর একজন ধর্মান্ধ মুসলমান। সুতরাং হিন্দু কৃষকদের উচিত এ আন্দোলনের বিরোধিতা করা।

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

ঙ. বাঁশের কেল্লা (Fort of Bamboo): তিতুমীর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারেন যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন সমর প্রস্তুতি ও উপযুক্ত সেনা-প্রশিক্ষণ। সেনাবাহিনীর আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। সময় এবং অর্থাভাবে তিনি আপাতত কলিকাতার নিকটবর্তী নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে একটি 'বাঁশের কেল্লা' বা দুর্গ নির্মাণ করেন। ইতিহাসে এ কেল্লাই 'নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা' নামে বিখ্যাত। তাঁর প্রিয় সহচর গোলাম মাসুম ও মিসকিন শাহ্-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে একটি অকুতোভয় কৃষকসেনা বাহিনী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার তিতুমীরকে দমন করার জন্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর একদল সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করে। কর্নেল স্টুয়ার্টের আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত বাহিনী বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করলে তিতুমীর অসীম সাহসের সাথে তা মোকাবিলা করেন। এ অসম যুদ্ধে তিতুমীরের কৃষকসেনারা পরাজিত হয় এবং তিতুমীর এ যুদ্ধে শহীদ হন। তিতুমীরের বিশ্বস্ত অনুচর গোলাম মাসুমসহ অনেককে ফাঁসি এবং বড় রকমের শাস্তি প্রদান করা হয়।

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

চ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে তিতুমীরের অবদান (Contribution of Titumir towards the liberation struggle of Bangladesh): তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন ও বারাসাত বিদ্রোহ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ। এ গণবিদ্রোহের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, রক্তদান ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর নয়। পাশাপাশি তাঁর পরিচালিত গণবিদ্রোহ ছিল শোষক জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। এটা ছিল কৃষক-কারিগর শ্রেণির মুক্তির লড়াই। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিল অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী সশস্ত্র প্রতিবাদ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুসজ্জিত ও মারণাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তিতুমীরের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। এজন্যই তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়েছে, তাঁর বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁর সংগ্রাম ও রক্তদান ব্যর্থ হয়নি। সামন্ত রাজা এবং নীলকর বণিকদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম এবং ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন পরবর্তীকালের সকল আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

তিতুমীর (১৭৮৬-১৮৩১)

তাঁর বীরত্ব গাথা বাঙালি জনগণকে অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা যুগিয়েছে। সাহস যুগিয়েছে প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। তিতুমীর যেভাবে সাধারণ কৃষকদের সংগঠিত করে, সামান্য ট্রেনিং দিয়ে দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে ব্রিটিশ বেনিয়া শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তেমনি ১৯৭১ সালে বীর বাঙালি জনগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হাতের কাছে যা পেয়েছিল তাই নিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০৩ নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

টপিক ০৩: নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩))

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

জীবনী (Life Sketch): নবাব আব্দুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইংরেজি, আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি প্রথম জীবনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং পরে ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন। ১৮৬৩ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমিতি' নামে তিনি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শিক্ষার প্রতি অনুরাগের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নবাব' এবং আরো পরে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন।

নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

সমাজ সংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তারে অবদান (Contribution towards Social Reform and spread of Education): সমাজ সংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তারে নবাব আব্দুল লতিফের অবদান ছিল অসামান্য। সংক্ষেপে এগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. ইংরেজি ভাষা তথা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ: ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করলে মুসলমানদের বিপর্যয় চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে আসে। গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক শ্রেণির ধর্মীয় নেতা ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাকে নাজায়েজ ঘোষণা করে। নবাব আব্দুল লতিফ নিজেই ইংরেজি, আরবি প্রভৃতি ভাষায় সুশিক্ষিত হয়ে স্বজাতিকে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন।

২. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা: ১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি বা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বাংলার মুসলমান জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

৩. মোহসিন ফান্ডের সুরক্ষা ও সুব্যবস্থাকরণ: নবাব আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টায় 'মোহসিন ফান্ডের' অর্থ শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সমস্ত দরিদ্র ও মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে প্রদান করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

৪. কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা উন্নত ও আধুনিকীকরণ: তিনি কলিকাতার আলীয়া মাদ্রাসাকে উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সচেষ্ট হন।

৫. হিন্দু কলেজকে সব ধর্মের ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা: তিনি কলিকাতার বিখ্যাত 'হিন্দু কলেজকে' হিন্দু- মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তাব রাখেন। এ প্রস্তাব গৃহীত হলে পরবর্তী সময়ে 'হিন্দু কলেজ' 'প্রেসিডেন্সি কলেজে' রূপান্তরিত হয়।

নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

বাংলার সৈয়দ আহমদ

উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নবাব আব্দুল লতিফও বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্যই তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো তাঁর অবদান ছিল বলেই তাঁকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়। শিক্ষার প্রতি তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়। তাঁর অবদান বাঙালি জনগণ কোনোদিনই ভুলবে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০৪ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

টপিক ০৪: নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

জীবনী (Life Sketch) : ঢাকার নবাব পরিবারে ১৮৭১ সালের ৭ জুন খাজা সলিমুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবাব খাজা আহসান উল্লাহ্ এবং পিতামহের নাম নবাব খাজা আব্দুল গণি। তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করে কিছুদিনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্বশীল সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। নবাব পরিবারের সন্তান হলেও সে সময়ে মুসলমানদের সার্বিক দুরবস্থা ও অসহায়ত্ব তাঁকে পীড়িত করে। তিনি এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করেন। ১৯১৫ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন। ব্রিটিশ-রাজভক্ত হলেও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য তিনি ছিলেন সচেষ্ট।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

রাজনৈতিক অবদান (Political Contributions) : নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্র রাজনৈতিক অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক. বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal): নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবদান হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলিম জনগণকে নেতৃত্ব প্রদান। তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলা প্রদেশে মুসলমান জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তারা ছিল অবহেলিত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন। প্রশাসনে তাদের প্রতিনিধিত্ব এবং প্রভাব ছিল না বললেই চলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট হিন্দু জমিদার, জোতদার, মহাজনদের শোষণ ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে বাংলার বিশেষ করে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। কলিকাতাকে কেন্দ্র করে যে নতুন শিল্পভিত্তিক আধুনিক মধ্যবিত্ত শহুরে সমাজ গড়ে ওঠে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কলিকাতায় মুসলমানরা হলেন মূলত শ্রমিক। পূর্ববঙ্গের কৃষকদের সোনালী পাটের আয় থেকে সরকার যে অর্থ পাচ্ছিলেন তা দিয়ে কলিকাতা শহরের উন্নয়ন ঘটলেও পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজের ভাগ্যের উন্নতি ঘটেনি।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণির সাথে মুসলমানরা প্রতিযোগিতাও করতে পারছিলেন না। বাঙালি মুসলমানদের এ ঘোরতর দুর্দিনে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের জন্য সচেষ্ট হন। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনও প্রশাসনিক সুবিধার্থে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাংলাকে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাকে বিভক্ত করা হয় এবং ১৫ অক্টোবর 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামক একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। ঢাকা হয় এ নতুন প্রদেশের রাজধানী। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই ছিল মুখ্য।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

খ. 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' গঠন: স্যার সলিমুল্লাহ্ ছিলেন দূরদর্শী নেতা। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গ হলে শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দু জনগণ এর বিরোধিতা করবে। এ জন্যই বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার দিনই তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী তৎপরতা মোকাবিলা এবং মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন। 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' গঠনের মধ্যেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির বীজ লুক্কায়িত ছিল।

গ. সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (Formation of All-India Muslim League) : স্যার সলিমুল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রাজনৈতিক অবদান হচ্ছে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু জনগণ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লে তিনিও সর্বভারতীয় একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে "নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে" মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়। নবাব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

ঘ. স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচন (Separate Electorate and Election): সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ায় মুসলমান জনগণ নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে সরকার গঠন ও নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এজন্যই মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার, সংরক্ষণ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংস্থাসমূহে আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি নিয়ে মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল ১৯০৬ সালে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ মুসলিম প্রতিনিধি দলের প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্। লর্ড মিন্টো মুসলিম প্রতিনিধিদলের বক্তব্য ও দাবি মেনে নেন। ১৯০৯ সালের ভারত সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য 'স্বতন্ত্র নির্বাচন' প্রথা স্বীকৃত হয়। এ স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা পরবর্তীকালে মুসলমান জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হয়।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

৬. শিক্ষা বিস্তারে অবদান (Contribution towards Spread or expansion of Education): নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ ছিলেন দূরদর্শী মানুষ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত না হলে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান না শিখলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

১. আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা: তিনি 'আহসানউল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল' নামে ঢাকায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে কলেজে উন্নীত হয়। বর্তমানে তা 'প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত হয়েছে এবং দেশে ও বিদেশে একটি ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

২. মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান: মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্তমানে এটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে তাঁকে এবং পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

৪. সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল প্রতিষ্ঠা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক হল নির্মাণ করা হয়। নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই 'সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল' নামে এ ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয়। এছাড়াও ঢাকা নগরীর প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো না কোনোভাবে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা লাভে ধন্য হয়েছে।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

চ. সলিমুল্লাহ এতিমখানা প্রতিষ্ঠা: এদেশের দুঃখী মানুষদের জন্য তিনি একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত 'সলিমুল্লাহ এতিমখানা' তাঁর সমাজসেবামূলক কাজের উজ্জ্বল স্বাক্ষর আজও বহন করছে।

উপসংহার (Conclusion): স্যার সলিমুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোনার চামচ মুখে দিয়ে, সম্ভ্রান্ত নবাব পরিবারে। যৌবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিও লাভ করেছিলেন। কিন্তু নবাব পরিবারের বিলাস-ব্যসন, আরাম-আয়েশ কিংবা লোভনীয় চাকরি কোনো কিছুই তাঁকে পূর্ব বাংলার মুসলমান মানুষের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯০৫ সালে মুসলমানদের জন্য পূর্ব বাংলায় যে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাঁর স্বপ্নের নগরী ঢাকা আজ বাংলাদেশের রাজধানী।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

টপিক ০৫: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

চিত্তরঞ্জন দাস-এর জন্ম ১৮৭০ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (I.C.S) পরীক্ষা দেয়ার জন্য বিলাতে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের ভারতবিদ্বেষ তাঁকে দুঃসহ কষ্ট দিয়েছিল বলে তিনি লোভনীয় I.C.S. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হননি। কর্মময় জীবনে তিনি একজন সফল আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। কিন্তু ভারতে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি সকল ধরনের বিলাসিতা পরিত্যাগ করেন এবং দেশ সেবা ও সহজ-সরল জীবনযাপন বেছে নেন। আমরণ তিনি তা বজায় রেখেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল অল্প সময়ের। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা না থাকলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। বাস্তববাদী এ রাজনীতিক ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালি। সমগ্র ভারতবর্ষের নেতা হলেও তিনি গর্ব করতেন একজন বাঙালি বলে। বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি কৃষ্টি ও বাঙালি জীবনধারায় গভীরভাবে বিশ্বাসী এ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষটি তাই বলেছিলেন যে, "নিজেকে আমি বাঙালি বলতে গর্ব অনুভব করি। বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাধনা, রয়েছে শাস্ত্র, কর্ম, ধর্ম, বীরত্ব, ইতিহাস এবং রয়েছে ভবিষ্যৎ। বাঙালিকে যে ঘৃণা করে, সে আমার বাংলাকে জানে না।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

স্বরাজ দল (Swaraj Party)

১৯২৩ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কংগ্রেসীরা নির্বাচন বয়কট না করে এতে অংশগ্রহণ করবে এবং আইনসভার নির্বাচিত আসনগুলো দখল করে সরকারি নীতির বিরোধিতা করবে। কিন্তু রাজা গোপালাচারী, কস্তুরী রঙ্গ আইয়ার, ড. আনসারী প্রমুখ কংগ্রেস নেতা এ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ সময়ে পরিবর্তনকামী (Pro-changers) এবং পরিবর্তন বিরোধী (No- changers)-এ দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯২২ সালের গয়ার অধিবেশনে কংগ্রেসের পরিবর্তন বিরোধীদের বা গান্ধীবাদীদের নেতা রাজা গোপালাচারী আনীত বয়কট প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়। এর ফলে চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। তিনি আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং আইনসভা বয়কট না করে এতে যোগদানের সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা ঘোষণা করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

তিনি ১৯২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর গয়ায় মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খান, ভি. জে. প্যাটেল, কেলকার, সত্যমূর্তি, জয়াকার প্রমুখের সহযোগিতায় একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ দলের নামকরণ করা হয় "কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ দল"। সংক্ষেপে "স্বরাজ দল" (Swaraj Party) নামেই এটি পরিচিতি অর্জন করে। এ নতুন দলের সভাপতি হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং সম্পাদক নিযুক্ত হন মতিলাল নেহেরু। স্বরাজ দলের কর্মসূচি বা দাবি ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। চিত্তরঞ্জন দাস হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ. কে. ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাস, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ্ রসুল প্রমুখের রাজনীতিতে প্রবেশের সাথে সাথে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন খাঁটি বাঙালি ও অসাম্প্রদায়িক। বাংলার অপর দুই নেতা চিত্তরঞ্জন দাস ও হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীও ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রগতিশীল ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিনষ্ট হবার উপক্রম হলে এ. কে. ফজলুল হক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, মোঃ আঃ করিম, মাওলানা আকরাম খান, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌঃ মুজিবর রহমান প্রমুখ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এবং হিন্দু-মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তি ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। চিত্তরঞ্জন দাসের 'স্বরাজ পার্টি, ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর এর কাউন্সিল সভায় এ চুক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

বেঙ্গল প্যাক্টের বিভিন্ন দিক ও শর্তাবলি

১। স্বায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করাই হবে এ চুক্তির উদ্দেশ্য।

২। বঙ্গীয় আইনসভায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

৩। ১৯০৯ সালে প্রবর্তিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৪। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৪০টি আসন লাভ করবে।

৫। সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫টি চাকরি সংরক্ষিত থাকবে এবং যে পর্যন্ত তারা সমতার পর্যায়ে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে শতকরা ৮০ জনকে ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হবে।

৬। চাকরিক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সমতা অর্জনের পর থেকে মুসলমান জনগণ চাকরির শতকরা ৫৫ ভাগ পাবে এবং অমুসলমানগণ শতকরা ৪৫ ভাগ পাবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে হিন্দু জনগণ ২০ ভাগ চাকরি পাবেন।

৭। কোনো সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পর্কিত কোনো আইন ব্যবস্থাপক সভায় পাস করতে হলে সে সম্প্রদায়ের নির্বাচিত তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।

৮। মসজিদের সম্মুখে গান-বাজনাসহ মিছিল করা চলবে না। গরু জবাই করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

"বেঙ্গল প্যাক্ট"-এর সমর্থনে চিত্তরঞ্জন দাস আইন পরিষদে বলেন যে, "স্বরাজের বুনিয়াদ রচনা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। স্বরাজ লাভের পর আমাদের সরকার হিন্দু সরকার না মুসলমান সরকার এরূপ কোনো সংশয় যাতে আমাদের মনে জাগ্রত না হয় সেজন্য আমরা এ চুক্তিতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত করেছি.... আমি চাই এজন্য হিন্দু মুসলিম উভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পারস্পরিক অবিশ্বাস নির্মূল করার জন্য সংগ্রাম করে যাবে"।

ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে এবং পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে চিত্তরঞ্জন দাস কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯২৫ সালে ১৬ জুন চিত্তরঞ্জন দাসের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এবং 'বেঙ্গল-প্যাক্ট' কার্যত অচল হয়ে পড়ে। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০৬ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

টপিক ০৬: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

ক. জীবনী (Life Sketch): ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বরিশালের (বর্তমানে ঝালকাঠি জেলার রাজাপুরের) সাতুরিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও গণিতে একই সাথে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি গণিতে এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০০ সালে বিখ্যাত আইনজীবী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র হিসেবে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এরপর তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করেন এবং ছয় বছর এ পদে চাকরি করেন।

কিন্তু চাকরির বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন, তোষামোদী তাঁকে আকৃষ্ট না করায় তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায় যোগ দেন এবং অতি দ্রুত সাফল্য লাভ করতে থাকেন। ১৯১১ সালে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং সর্বভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শুরু হয় তাঁর সফল রাজনৈতিক জীবন। ১৯৬২ সালে এ অসাধারণ রাজনৈতিক নেতা ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

খ. রাজনীতিতে শেরে বাংলার অবদান (Contributions of Sher-e-Bangla in Politics): শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন একটি রাজনৈতিক বটবৃক্ষ। ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি বিশেষ করে তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে শেরে বাংলা ফজলুল হক ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাঙালির প্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক অবদানসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান: ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩০-৩২ সালে লন্ডনে তিনটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সেসব বৈঠকে অসাম্প্রদায়িক মন নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং জোরালো বক্তব্য পেশ করেন।

২. হিন্দু-মুসলিম স্বার্থ সমন্বয়: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন মানবতাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক নেতা। ১৯১৬ সালে হিন্দু-মুসলমানদের স্বার্থের সুসমন্বয়ের জন্য 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' প্রণয়নে শেরে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্যই ১৯১৮ সালে তিনি একই সময়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৯ সালে তিনি মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

৩. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক: ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয় তার উত্থাপক ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। মূল লাহোর প্রস্তাবে 'একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র' (Independent states) গঠনের কথা বলা হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের ফলে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

গ. কৃষকদের কল্যাণ সাধনে শেরে বাংলার অবদান (Contributions of Sher-e-Bangla towards the welfare of Peasants): শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক শক্তির উৎস ছিল এ দেশের কৃষক সমাজ। কৃষকদরদী এ জননেতা দূরদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, বাংলাদেশ এবং বাঙালির উন্নতি নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নতি তথা কৃষকসমাজের ভাগ্যের উন্নতির উপর। অবহেলিত কৃষকদেরকে উন্নতির জন্য তিনি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

১. 'কৃষি ঋণ আইন' প্রণয়ন: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯১৩ সালের ৪ এপ্রিল বঙ্গীয় আইন পরিষদে 'কৃষি ঋণ আইন' পাস করে বাংলার অসহায় কৃষকদেরকে সুদখোর মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

২. কৃষক-প্রজা আন্দোলন: অবহেলিত ও অশিক্ষিত কৃষকদেরকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'কৃষক-প্রজা আন্দোলন' গড়ে তোলেন।

৩. 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কৃষকদেরকে ভালবাসতেন এজন্যই ১৯২৯ সালে তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত দলের নামকরণ করা হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য এ দলের দরজা ছিল উন্মুক্ত।

৪. 'ঋণ সালিসী বোর্ড' গঠন: ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তিনি 'ঋণ সালিসী বোর্ড' গঠন করে কৃষকদের ঋণভার লাঘব করার চেষ্টা করেন।

৫. 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণয়ন: ১৯৩৮ সালে মূলত তাঁরই উদ্যোগে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পাস এবং এর ফলে ভূমির উপর প্রজার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইনের আলোকেই ১৯৫০ সালে 'জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন' পাস হয় এবং জমিদারি প্রথার অবসান ঘটে।

ঘ. শিক্ষা বিস্তারে শেরে বাংলার অবদান (Contribution of Sher-e-Bangla towards the Spread of Education): শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রগতি অর্জন করতে না পারলে বাংলার মুসলমানদের উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাই তিনি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

১. সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের সংগঠক: ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক। এ সম্মেলনে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

২. শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ তিনি ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে একটি শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এ শিক্ষা পরিকল্পনা গণমুখী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে।

৩. ছাত্রাবাস নির্মাণ: শেরে বাংলার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কলিকাতায় টেইলর হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও বেকার হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠা: ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর অবদান ছিল। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থেই পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফজলুল হক হল' প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. ইসলামিয়া কলেজ ও মুসলিম শিক্ষা তহবিল গঠন: ১৯২৪ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি কলিকাতায় 'ইসলামিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠা ও 'মুসলিম শিক্ষা তহবিল' গঠন করেন।

৬. লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ও ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠা: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কলিকাতায় 'লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ' এবং ঢাকায় 'ইডেন কলেজ' স্থাপন করেন।

৭. পূর্ববঙ্গে কলেজ প্রতিষ্ঠা: শিক্ষানুরাগী এ নেতার প্রচেষ্টায় ঢাকার তেজগাঁও কৃষি কলেজ, মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ, বরিশালের চাখার কলেজ এবং রাজশাহীর চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে 'আদিনা ফজলুল হক কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে একটি শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটতে থাকে।

উপসংহার (Conclusion): 'ডাল-ভাতের রাজনীতির' প্রবক্তা, বাঙালির হৃদয়ের একান্ত আপনজন, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অগ্রপথিক, কৃষক-প্রজার কল্যাণ সাধনের অক্লান্ত সংগঠক, বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত এবং মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক এই মহান নেতা বাঙালির হৃদয়ে চির অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আজ আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিলেও তিনি বেঁচে থাকবেন বাঙালিদের মনের মণিকোঠায়। তাঁর আদর্শ আমাদেরকে মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করবে অনন্তকাল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০৭ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

টপিক ০৭: হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

ক. জীবনী (Life Sketch): হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর জীবন বর্ণাঢ্য, কর্মমুখর ও বৈচিত্র্যময়। ১৮৯২ সালে পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মেদিনীপুরে তাঁর বিদূষী জননী খুজিস্তা আখতার বানু এবং বিদ্বান মামা স্যার আবদুল্লাহ্ সোহ্রাওয়ার্দীর নিকট বিদ্যারম্ভ করেন। তারপর তাঁর শিক্ষা শুরু হয় কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে তিনি অনার্সসহ বি. এসসি. পাস করেন। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১১ সালে তিনি বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ বি. এসসি. এবং বি. সি. এল. ডিগ্রি লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পুনরায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং ইংরেজিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যারিস্টার হয়ে ১৯২০ সালে দেশে ফিরেই তিনি স্বরাজ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

এ সময়ে তিনি প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর শুরু হয় তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মমুখর রাজনৈতিক জীবন। আইয়ুব খানের শাসনামলে তিনি গ্রেপ্তার এবং নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। চিকিৎসার জন্য বৈরুতে অবস্থানকালে 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী বৈরুত ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল কক্ষে ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ভোর তিনটায় একান্ত নিঃসঙ্গ পরিবেশে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

খ. রাজনৈতিক অবদান (Political Contributions): ক্ষুরধার যুক্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞা, অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং বাচনভঙ্গির অধিকারী সোহ্রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক অবদান ছিল নিম্নরূপ :

১. খেলাফত আন্দোলনের সংগঠক: বিশ শতকের বিশের দশকে এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী খেলাফত কমিটির কলিকাতা মহানগরী শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং সাংগঠনিক যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন।

২. শ্রমিক নেতা: হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় শ্রমিক নেতা হিসেবে। তিনি কলিকাতার নাবিক, রেল শ্রমিক-কর্মচারী, পাটকল ও সুতাকল শ্রমিক-কর্মচারী, রিক্সাচালক ও গাড়িচালক মেহনতি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

৩. মুসলিম লীগ সংগঠন: ১৯৩১ সালে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী 'নিখিল ভারত মুসলিম যুব সংস্থা' গঠন করেন। ১৯৩২ সালে কলিকাতায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনের' আহ্বায়ক সমিতির সভাপতি হন। অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্য তাঁকে মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয় এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও অপূর্ব সাংগঠনিক তৎপরতার জন্যই মুসলিম লীগ এ নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করে। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগেরও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সব ক'টি মুসলিম আসনে জয়যুক্ত এবং সমস্ত ভারতের মধ্যে একমাত্র অবিভক্ত বাংলা প্রদেশেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর সবটুকু কৃতিত্ব অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর। এ নির্বাচনের পর তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন।

৪. যুক্ত বাংলার সপক্ষে আন্দোলন: ১৯৪৭ সালের ৩ জুন পরিকল্পনায় ব্রিটিশ-ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতা এবং 'পাকিস্তান' দাবি মেনে নেওয়ার পাশাপাশি 'বাংলা' এবং 'পাঞ্জাব' প্রদেশকে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন। মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের অনেক নেতা এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। হিন্দু মহাসভার নেতাগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বঙ্গ বিভাগকে স্বাগত জানান। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী বঙ্গ বিভাগের পরিণামের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'বঙ্গ বিভাগ করা হলে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশেই বাঙালিরা দুর্বল হয়ে পড়বে। যুক্ত বাংলার অবিভাজ্য সত্তাকে দুভাগে ভাগ করার অর্থ উভয় বাংলার শক্তিকে পঙ্গু করার ব্যবস্থা। দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে, "বৃহত্তর বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানদের এক স্বাধীন সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করে আমরা বাংলাকে সর্বতোভাবে উন্নত করে তুলতে চাই। বঙ্গভঙ্গের পরিবর্তে হিন্দু-মুসলমানদের 'অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গই' আমাদের দাবি করা উচিত।"

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর 'অবিভক্ত বাংলা রাষ্ট্র' দাবির সমর্থনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম, বাংলা কংগ্রেস দলের নেতা শরৎ বসু, কিরণ শংকর রায় প্রমুখ আন্দোলন শুরু করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং মহাত্মা গান্ধীও 'অবিভক্ত বাংলার' জন্য সোহ্রাওয়ার্দীর প্রচেষ্টাকে সমর্থন প্রদান করেন। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থক মুসলিম লীগ নেতা এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সমর্থক কংগ্রেস নেতাদের অদূরদর্শিতা এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা নেতাদের একগুঁয়েমির জন্য 'অবিভক্ত বাংলা' গঠনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

৫. আওয়ামী লীগ গঠন: ১৯৪৮ সালের ৩ জুন হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী কলিকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। কিন্তু ঢাকার মাটিতে পা ফেলার সাথে সাথেই তাঁর চিরকালের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের নেতা ও পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁকে পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রদান করেন। পাকিস্তান গণপরিষদে তাঁর সদস্যপদও মুসলিম লীগ সরকার বাতিল করে দেয়। মুসলিম লীগ এ সময় গুটিকয়েক ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়। 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী অনুভব করেন যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী বিরোধী দলের। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় গণতন্ত্রকামী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ।' ১৯৫০ সালে শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের' সভাপতি হন। পরে ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগের' 'মুসলিম' শব্দটিকে বাদ দিয়ে এ দলটিকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

৬. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন: গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার পূর্ব-বাংলায় ১৯৫৪ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী এ নির্বাচনে প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রমনা দলগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় '২১ দফা কর্মসূচির' ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের 'কৃষক শ্রমিক পার্টি', গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম দলকে নিয়ে গঠিত হয় 'যুক্তফ্রন্ট'। যুক্তফ্রন্টের জনসভায় উপস্থিত জনগণ হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, শেরে বাংলা, মাওলানা ভাসানী এবং যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হতে থাকেন। অতিদ্রুত যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যশোরে এক নির্বাচনি জনসভায় হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ঘোষণা করেন যে, 'এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ মাত্র নয়টি আসন পাবে'। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ মাত্র নয়টি আসনই পেয়েছিল।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

গ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সোহরাওয়ার্দীর অবদান : সংসদীয় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি, আইনের শাসন, আইনসভার সার্বভৌমত্ব এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর ছিল অসামান্য শ্রদ্ধা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল নিম্নরূপ :

ক. বিরোধী দলের স্রষ্টা তিনিই পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের স্রষ্টা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শক্তিশালী বিরোধী দল ব্যতীত গণতন্ত্র অর্থহীন। শত প্রলোভন ও লাঞ্ছনা-নির্যাতনের মুখেও গণতন্ত্রের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন যোদ্ধা।

খ. সামরিক শাসনের বিরোধিতা: ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে পাকিস্তানের সকল নেতা ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। অনেকে আত্মগোপনও করেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী নির্ভীক চিত্তে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

গ. এন. ডি. এফ. গঠন: গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সকল রাজনৈতিক দলের নেতাকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালান। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৬২ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'National Democratic Front' (NDF) গঠিত হয়। এজন্য আইয়ুব খান তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। গণতন্ত্রে জনগণের কথাই যে শেষ কথা, তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'ভাল সরকার স্বশাসিত সরকারের বিকল্প নয়' (Good government is no substitute for self-government) ।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

ঘ. নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস: হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এজন্য তিনি বলেছিলেন, "ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্ আমাকে এমনভাবে কাজ করার তওফিক দিন, যেন আমার মৃত্যুর পর দেশবাসী বলতে পারে যে, শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী এমন একজন লোক ছিলেন যিনি বিনা ষড়যন্ত্রে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং বিনা ষড়যন্ত্রেই দেশ সেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আমার একমাত্র ভরসা হচ্ছে গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্রই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই আমার শেষ কথা।" আজীবন তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। উগ্র, হঠকারী ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তিনি বিশ্বাস করতেন 'বুলেটের চেয়ে ব্যালটই শক্তিশালী।'

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

৬. মৌলিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা: ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন। এজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর কর্মময় জীবন মূল্যায়ন করেই তাঁকে 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। গণতন্ত্রকামী মানুষের অন্তরে সোহ্রাওয়ার্দীর আসন তাই চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতাসীন থাকাকালে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানকে 'সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান' নামকরণ করে তাঁর প্রতি বাঙালি জনগণের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০৮ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

টপিক ০৮: মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

ক. জীবনী (Life Sketch): সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামের এক অখ্যাত দরিদ্র পরিবারে ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। বাল্যকালে পিতাকে এবং কৈশোরে মাকে হারিয়ে অসহায় আব্দুল হামিদ খান ওরফে 'চেগা মিয়া' চাচা ইব্রাহীম খানের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন। তিনি কিছু দিন স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত আব্দুল হামিদ খান ছিলেন ছোটবেলায় অশান্ত ও দুরন্ত স্বভাবের। মাদ্রাসার সীমাবদ্ধ জীবন তাঁকে তাই ধরে রাখতে পারেনি। এরপর শুরু হয় ভবঘুরে জীবন। এমনকি বেঁচে থাকার তাগিদে তিনি দিনমজুর ও কুলির কাজও এ সময় করেছিলেন। ভবঘুরে তরুণ আব্দুল হামিদ খান একসময় ইরাকি আলেম ও ধর্ম প্রচারক শাহ্ নাসিরুদ্দিন বোগদাদীর আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর নিকট তিনি কুরআন-হাদিস ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

তিনি যুক্ত প্রদেশের দেওবন্দ মাদ্রাসায় কিছুকাল ইসলামি শিক্ষালাভ করেন। এরপর তিনি জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবির একটি মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন এবং সেখানকার জমিদার শামসুদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর জমিদারি দেখাশুনা করার দায়িত্ব পালন করেন। জমিদারি কাজের সূত্রে কলিকাতায় গিয়ে তিনি স্বরাজপন্থি কংগ্রেসকর্মী ও বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এরপর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান আসামের জলেশ্বরের পীর নাসিরুদ্দিনের সান্নিধ্যে দিন যাপনকালে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হন এবং 'রাওলাট আইনের' বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে জীবনের প্রথম কারাবরণ করেন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২৪ সালে তিনি আসামের ধুবড়ী মহকুমার ভাসানচরে কৃষকদের সংগঠিত করে

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

একটি কৃষক সম্মেলন করেন। এরপর থেকেই তাঁর নাম হয় 'মাওলানা ভাসানী'। আসামে বসবাসকারী পূর্ববাংলার জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে তিনি সচেষ্ট হন। এজন্য তিনি আসাম সরকারের হাতে বহুবার নিগৃহীত ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৩০ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং যোগ্যতাবলে ধীরে ধীরে আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে সিলেটবাসীরা 'গণভোটের' মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগদান করে। স্বাধীন পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারের বাঙালিদের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' এবং ১৯৫৭ সালে 'ন্যাপ' অর্থাৎ 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠিত হয়। পাকিস্তানি শাসনামলে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আপসহীন লড়াই চালিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি 'মুজিবনগর সরকারের' 'উপদেষ্টা পরিষদের' সদস্য ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর এ বিপ্লবী কর্মপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

খ. কৃষক সংগ্রাম ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান: মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সত্যিকার অর্থে কৃষক নেতা। কেননা তিনি নিজেও ছিলেন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার সাথে তিনি ছিলেন আজন্ম পরিচিত। তাঁর সম্মেলন বা আন্দোলনের রাজনীতি প্রধানত দরিদ্র, অবহেলিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে সামন্তবাদ বিরোধী। এ জন্য তাঁর কৃষক আন্দোলনের ওপর প্রথম আঘাত আসে জমিদার-জোতদারদের পক্ষ থেকে। রাজশাহীর ধূপঘাটের জমিদার, ময়মনসিংহের সন্তোষ ও গৌরীপুরের মহারাজা এবং পাবনার সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে তিনি পর্যায়ক্রমে কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন। নিরন্ন, অবহেলিত, অশিক্ষিত কৃষকদের অধিকার সচেতন করে তোলার জন্যই তিনি ১৯২৯ সালে আসামের ধুবড়ী মহকুমার ভাসানচর, ১৯৩১ সালে টাঙ্গাইলের সন্তোষের কাগমারীতে, ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জের কাওরাখোলায়, ১৯৩৩ সালে গাইবান্ধার ঘাঘমারায়, কামরূপ জেলার বড় পেটা (১৯৩৭ সাল), আসামের মঙ্গলদই ও টাঙ্গাইলের কাগমারী (১৯৪১ সাল) প্রভৃতি জায়গায় কৃষক সম্মেলন ও সমাবেশ অনুষ্ঠান করেন। পূর্ব-বাংলা থেকে আসামে গিয়ে বসবাসকারী বাঙালি মুসলমান কৃষকদের বিতাড়িত করার জন্য আসামের বদৌলই সরকার ১৯৩৭ সালে 'লাইন প্রথা' নামে যে কুখ্যাত আইন জারি করে-তার বিরুদ্ধে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আপসহীন লড়াই চালিয়েছিলেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

স্বাধীন পাকিস্তানেও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কৃষকদের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের জন্য ছিলেন নির্ভীক সেনানী। পাকিস্তানি শাসনামলে তিনি সকল প্রকার আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। ঘুষ, দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপসহীন। পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি জনগণের অধিকার ও স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তিনি ছিলেন আপসহীন ও নিবেদিতপ্রাণ। মার্কসবাদে বিশ্বাসী না হলেও তিনি ছিলেন সাম্যে বিশ্বাসী। কৃষক-শ্রমিকদের মুক্তির জন্য, জনঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি সমাজতন্ত্রের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন ধর্মের সাথে সমাজতন্ত্রের সুষ্ঠু সমন্বয়। তিনি 'কৃষক-মজুর রাজ' কায়েম করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম লীগ সরকারের জুলুম প্রতিরোধের জন্য, কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী কাজে বাধা দেওয়ার জন্য অনেক সময় ধর্মঘট, হরতাল ও 'জ্বালাও-পোড়াও-ঘেরাও'-এর রাজনীতি তিনি বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে তিনি সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে ভারত গঙ্গা নদীর পানি একতরফাভাবে নিজ দেশে প্রবাহিত করানোর উদ্যোগ নিলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এর বিরুদ্ধে 'লং মার্চ' করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কৃষকদের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

গ. রাজনৈতিক অবদান ব্রিটিশ শাসনামল থেকে পাকিস্তানি শাসনামল এমনকি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ শাসনামলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী রাজনৈতিক অঙ্গনে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. মুসলিম লীগের রাজনীতিতে অবদান: মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কংগ্রেস ত্যাগ করে আসাম মুসলিম লীগে যোগদান করেন ১৯৩৭ সালে। অল্পকালের মধ্যে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি আসামের মুসলমানদের বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে গিয়ে বসতি স্থাপনকারী মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আপসহীন লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে আসামে মুসলিম লীগ দ্রুত তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সংগঠিত হয়। ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

২. ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও গণভোটে অবদান: ১৯৪৫-৪৬ সালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এতে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর সিলেট পাকিস্তান না ভারতে যোগদান করবে, এ নিয়ে 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ভাসানী ১৯৪৭ সালের এ গণভোটের সময় সমগ্র সিলেটে চষে বেড়ান এবং পাকিস্তানে যোগদান করার জন্য সিলেটবাসীকে আহ্বান জানান। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় সিলেটের জনগণ গণভোটে 'পাকিস্তানে' যোগদান করার রায় বা সম্মতি প্রদান করে।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

৪. আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে অবদান: মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর উদ্যোগে এবং তরুণ মুসলিম লীগ সদস্যদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি শীঘ্রই এ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

৫. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন: ১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে সাথে পররাষ্ট্রনীতি ও স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৫৭সালে আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে এ মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এ বছরই ঢাকায় সকল বামপন্থি দল ও মতের লোকদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্রমনস্ক নেতা এবং কিছু কিছু বামপন্থি নেতাদের সমন্বয়ে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' নামে একটি দল গঠন করেন। তিনি এ দলের সভাপতি হন এবং সেক্রেটারি জেনারেল হন পশ্চিম পাকিস্তানের মাহমুদুল হক ওসমানী।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে অবদান : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' (মুজিব নগর সরকার) গঠিত হলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এ সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঙ. সামন্তবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বিরোধী আন্দোলনে অবদান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও সম্প্রসারণবাদের ঘোরতর বিরোধী। আজন্ম তিনি এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন শোষণ-বঞ্চনা এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আপসহীন বজ্রকণ্ঠ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ০৯ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

টপিক ০৯: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

সংক্ষিপ্ত জীবনী (Short Life Sketch): ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন তৃতীয়। ছোটবেলায় বাবা-মা আদর করে তাঁকে ডাকতেন 'খোকা' বলে। ছোটবেলায় তিনি গিমাডাংগা প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল এবং গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৪ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে সাময়িকভাবে তাঁর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। ১৯৪২ সালে তিনি এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। তিনি ধর্মতলা স্ট্রীটের বেকার হোস্টেলে থাকতেন। ১৯৪৩ সালে তিনি ছাত্র অবস্থাতেই কলকাতাস্থ ফরিদপুর জেলা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জি. এস.) নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি (বি.এ.) লাভ করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালন করে সকলের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এরপর শুরু হয় তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সুসংগঠিত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে তিনি বারবার গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি রেসকোর্সের জনসমুদ্রে ঘোষণা করেন যে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ (রাত বারোটার পর) তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলে তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশের মাটিতে ফিরে আসেন এবং রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি চক্রান্তের শিকার হয়ে কিছু বিপথগামী সেনার হাতে তিনি পরিবার পরিজনসহ নির্মম-নৃশংসভাবে নিহত হন। সেদিন খুনিরা বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা, ছোট ভাই শেখ নাসের, ভগ্নীপতি ও কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবত, পুত্রদ্বয় মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ও শেখ জামাল, ৭ বছরের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আঃ রব সেরনিয়াবতের দৌহিত্র সুকান্ত আব্দুল্লাহ্ বাবু, সেরনিয়াবতের কন্যা বেবী সেরনিয়াবত ও আরিফ সেরনিয়াবত, ভ্রাতুস্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে তথা যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মনি এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আব্দুল নঈম খানকে নির্মমভাবে বুলেট ও বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

ছাত্র সংগঠক শেখ মুজিব: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম ছাত্রলীগ দুটো ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ডান ও রক্ষণশীল ধারার নেতা ছিলেন শাহ্ আজিজুর রহমান এবং প্রগতিশীল ধারার নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, নৈমুদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমানসহ ছাত্রলীগের অন্যান্য প্রগতিশীল নেতাদের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রকর্মীসভায় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে একটি পৃথক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়। অতি দ্রুত এই ছাত্র সংগঠনটি বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার অতন্ত্র প্রহরীতে পরিণত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টি এবং অসাম্প্রদায়িক ছাত্র রাজনীতি গড়ে তুলতে, ৬২-এর সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ৬-দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণআন্দোলন এবং সবশেষে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের হাতে গড়া এ ছাত্র সংগঠনটির ভূমিকা ছিল অসামান্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

রাজনৈতিক সংগঠক ও নেতা শেখ মুজিব: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের একাংশের স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ কিছু সংখ্যক স্বাধীনচেতা ও প্রগতিশীল যুবনেতাদের মাথায় একটি প্রগতিশীল বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টির চিন্তা জন্ম নেয়। অবশেষে মূলত তাঁদের মতো যুবনেতাদের উদ্যোগেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন কে. এম. দাশ লেনের বিখ্যাত 'রোজ গার্ডেনের' হলরুমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলে। নবগঠিত এ সংগঠনের প্রথম সভাপতি হন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক হন শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক হন শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বর্জন করে একে একটি অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করা হয়। দলটির নতুন নাম হয় 'আওয়ামী লীগ'। জন্মের পর থেকেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের তথা সরকারের সকল অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে থাকে আওয়ামী লীগ। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন এবং সবশেষে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগই ছিল প্রধান বিরোধী দল, প্রধান সংগঠক বা মূল চালিকাশক্তি। আওয়ামী লীগের সকল কার্মকাণ্ডের উদ্যোক্তা ও রূপকার ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

৬ দফা কর্মসূচি ও শেখ মুজিবুর রহমান: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতন। ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলে বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের কাঁচামালের যোগানদাতা একটি কলোনি বা উপনিবেশে। শিল্প-কল-কারখানা সবই স্থাপিত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক-বেসামরিক আমলারা ছিলেন প্রায় সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানি। সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখার অর্থাৎ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর হেডকোয়ার্টার, দেশের রাজধানী সবই স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এরূপ বৈষম্য ও বঞ্চনা এবং তা থেকে সৃষ্ট অসহায়ত্বের অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক 'ছয় দফা কর্মসূচি' পেশ করেন। এ কর্মসূচিকে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন। ৬-দফা কর্মসূচি দ্রুত অবহেলিত ও স্বাধিকারকামী বাঙালি জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়। ৬-দফার সমর্থনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্রুত দানা বাঁধতে থাকে। স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম খানের সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে 'ভারতের চর', 'ইসলামের দুশমন' এবং রাষ্ট্রবিরোধী' বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলের নেতাদের বিভিন্ন জেলার ফৌজদারি আদালতে মামলা করে আটক করা হতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় সরকার আন্দোলনকারী জনতার ওপর গুলি চালালে ১২ জন নিরীহ মানুষ নিহত, শত শত মানুষ আহত এবং প্রায় এক হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হন। কিন্তু সরকার ৬-দফা আন্দোলন বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়। এ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনকামী বাঙালি জনগণের নিকট নির্ভীক ও আপসহীন নেতায় পরিণত হন। ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালিদের বাঁচার দাবি। ৬ দফা ছিল বাঙালির মুক্তিসনদ, বাঙালির ম্যাগনাকার্টা। ৬ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো বিকশিত হয়, বাঙালি জনগণ সংগ্রামের শক্তি অর্জন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম খান ১৯৬৭ সালের ১৬ জুন নির্ভীক সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)-কে গ্রেপ্তার, তাঁর 'নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত এবং 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা করে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে পাইকারিভাবে গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। এর ফলে সচেতন বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠতে থাকে। আইয়ুব-মোনায়েম খান বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে তখন সরকার গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে কীভাবে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। '৬-দফা আন্দোলনের' জন্য 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে অভিযুক্ত ও 'দেশরক্ষা আইনে' আটক শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়।

কিন্তু ১৮ জানুয়ারি জেল গেটের বাইরে পা রাখার সাথে সাথেই তাঁকে 'পাকিস্তান আর্মি, নেভী এবং এয়ারফোর্স এ্যাক্ট'-এ গ্রেপ্তার করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় যে, "শেখ মুজিবসহ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভারতের আগরতলায় গোপন বৈঠকে বসে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র করছিল।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' তৈরি করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল বিচারপতি জনাব এম. এ. রহমানের নেতৃত্বে একটি 'বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও জাতির পিতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান: 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' বিরুদ্ধে দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠলে আইয়ুব-মোনায়েম খানের সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি এদেশের ছাত্রসমাজ '১১ দফা কর্মসূচি' ঘোষণা করলে জনগণের বিক্ষোভ গণবিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। ১১ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন দমনে সরকার যতই গুলিবর্ষণ ও নির্যাতন বৃদ্ধি করতে থাকে ততই আন্দোলনরত জনগণ মারমুখী হয়ে ওঠতে থাকে। পুলিশী নির্যাতন ও গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি হরতাল চলাকালে পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ঢুকে হামলা ও লুঠতরাজ চালায়। ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ) নিহত হলে গণআন্দোলনের চরিত্র ও গতি আরো দুর্বার এবং অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ২৪ জানুয়ারি রুস্তম, দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউরসহ খুলনায় তিনজন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে পাকিস্তানি সেনারা ঠাণ্ডামাথায় বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। ফলে গণআন্দোলন প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে। আইয়ুব-মোনায়েম খান আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহার এবং জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানের সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ সংবর্ধনা সভায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধু: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোঃ ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করার অনুমতি প্রদান করেন। ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন এবং ২২ অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলায় প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৫ ও ২২ অক্টোবরের পরিবর্তে ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৯ ডিসেম্বর। জলোচ্ছ্বাস-দুর্গত এলাকার কয়েকটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পি.পি.পি. পশ্চিম পাকিস্তান অংশে ৮১টি আসন লাভ করলেও পূর্ব পাকিস্তান অংশে কোনো আসন লাভ করেনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ নির্বাচনের ফলে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়। স্বাধীন বাংলাদেশের আগমনী বার্তা বহন করে এনেছিল এ নির্বাচন।

শান্তিপূর্ণ ও অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু: ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্যগণ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) শপথ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারেন এজন্য অবাঙালি পশ্চিমা শিল্পপতি, আমলা, সেনানায়ক ও রাজনীতিবিদগণ এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানসহ অধিকাংশ জেনারেলকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, "পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদেরকে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। এরপরও জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে তা' 'কসাইখানায়' পরিণত হবে।"

আন্দোলনমুখী গণজোয়ারের ভয়ে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, "২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং তার পূর্বে ১০ মার্চ ঢাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য ১২ জন নেতার এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।" কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘোষণার মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষ্য করে প্রত্যয়দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "বাঙালির তাজা রক্ত মাড়িয়ে আমি কোনো সম্মেলনে বসতে পারিনা।" এ সময় ছাত্র শ্রমিক আপামর জনতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার দাবি জানাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন যে, আগামী ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ: ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে সমগ্র বাঙালি জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বাধিকার আন্দোলন পরিণত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে। চারদিকে 'জয় বাংলা'; 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা-মানিনা মানিনা'; 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার-আমার ঠিকানা'; 'জনগণের একদফা-বাংলার স্বাধীনতা'; 'তোমার দেশ-আমার দেশ-বাংলাদেশ-বাংলাদেশ', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর' প্রভৃতি শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সারাদেশ চলতে থাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশনায়। সমগ্র দেশবাসী বড় ধরনের বা চূড়ান্ত রাজনৈতিক ঘোষণার অপেক্ষায় অধীর। এমন সময় ঘোষণা এলো যে, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জনগণের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দিবেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে 'রাজনীতির কবি' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদাত্তকণ্ঠে ১৮ মিনিটের যে ঘোষণা বা ভাষণ প্রদান করেন তা বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দলিল হিসেবে, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে খ্যাত হয়ে থাকবে। তাঁর বক্তব্য ছিল চমৎকার, সারগর্ভ, তেজস্বী, যুক্তিযুক্ত, তির্যক, তীক্ষ্ণ ও দিকনির্দেশনাপূর্ণ।

অপূর্ব শব্দশৈলী, বাক্যবিন্যাস ও উপস্থাপনাগুণে ভাষণটি ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্তই আপন ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ ভাষণে তিনি পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাঙালিদের অবস্থা ব্যাখ্যা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরা, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা, সমগ্র বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, শত্রুর মোকাবিলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'। তিনি স্বভাবজাত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্'। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। এ ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর একটি। অনেকে এজন্য এ ভাষণকে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন প্রদত্ত ১৮৬৩ সালের 'গেটিসবার্গ বক্তৃতার' সাথে তুলনা করেন। অনেকে তাঁর এ ভাষণকে 'অমর রচনা' ও 'বাঙালির মহাকাব্য' বলে অভিহিত করেছেন। এ ভাষণ, এ মহাকাব্যের মর্মবাণী বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের ধারা ও স্বাধীনতার লালিত স্বপ্ন থেকে উৎসারিত। 'ইউনেস্কো' বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

স্বাধীনতার ঘোষণা: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে (রাত বারোটার পর) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হবার পূর্বেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত তারবার্তাটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দেন। ইংরেজি ভাষায় স্বাধীনতার এ সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:

"ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা' কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগার থেকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তিলাভ করে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২ জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু কতগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যার সুফল এদেশের মানুষ আজও ভোগ করছে। তাঁর এসব ভূমিকা তথা অবদান নিম্নরূপ :

১। কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ চিন্তা এবং সুদসহ তাদের বকেয়া খাজনা মওকুফ: ১৯৭১ সালে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকালে এদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক গৃহহীন, সম্পদহীন হয়ে পড়ে। এসব রিক্ত-নিঃস্ব কৃষককে বাঁচাবার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধু জানতেন যে, জমি এদেশের কৃষকের কাছে তাদের সন্তানের মতো প্রিয়। তিনি এটাও জানতেন যে, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। এজন্যই তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলো হলো:

(১) ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১৪ এপ্রিল (৩০ চৈত্র) পর্যন্ত সকল প্রকার কৃষি জমির খাজনা ও তার সুদ মওকুফ করা হয়।

(২) ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন।

(৩) পরিবারপিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করা হয়।

(৪) পাকিস্তান শাসনামলে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদেরকে তাঁদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেয়া হয়।
(৫) খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার জন্য সারাদেশে খাদ্যগুদাম নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়।
(৬) কৃষিপণ্যের ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়।
(৭) ১৯৭৩ সালের মধ্যে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা করা হয়।
(৮) সারাদেশে হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার লো-লিফট পাম্প, ২৯০০ গভীর নলকূপ ও ৩০০০ অগভীর নলকূপ, ধান, পাট ও গমবীজ এবং ইউরিয়া, পটাশ ও টি.এস.পি. সার ১৯৭২ সালের মধ্যেই কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়।
(৯) কৃষিবিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(১০) কৃষকদের উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' নামক সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

(১১) শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের সুবিধার জন্য ভারতের সাথে আলোচনার পর ফারাক্কা দিয়ে পদ্মা নদীতে ৫৪ হাজার কিউসেক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা আদায় করা হয়। গ্রামের উন্নতি ও গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী করে তোলা ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। এজন্য কৃষি ও কৃষকের উন্নতি, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের সুষম বণ্টন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু 'গ্রাম-সমবায় প্রকল্প' প্রণয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ফলে বঙ্গবন্ধুর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ হয়নি।

২। জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় কুচকাওয়াজ সঙ্গীত নির্বাচন: ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জাতীয় পতাকায় বাংলাদেশের মানচিত্র থাকবে না, থাকবে লালসূর্য। মন্ত্রিসভার এ বৈঠকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'-এর প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে গৃহীত হয়। 'জাতীয় কুচকাওয়াজ সঙ্গীত' হিসেবে গৃহীত হয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চল চল চল' সঙ্গীত।

৩। জাতীয় ফল, ফুল, পশু, পাখি নির্বাচন: ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় ফল কাঁঠাল, জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার (বাঘ) এবং দোয়েলকে জাতীয় পাখি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৪। জাতীয় দিবস ঘোষণা: ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২৬ মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস' এবং ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা: ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২৬ মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস' এবং ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস'কে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র জমা দানের নির্দেশ: ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দিতে বলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকী এবং তাঁর "কাদেরিয়া বাহিনীর" ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র জমা দান করে। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি মুজিব বাহিনী প্রধান শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান বঙ্গবন্ধুর নিকট মুজিব বাহিনীর অস্ত্র জমা দেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি সরকার মুজিব বাহিনীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সকল সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করে।

৭। নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিকরণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের প্রতি সংবেদনশীল। স্বাধীনতা লাভের পর দ্রব্যমূল্যের দ্রুত বৃদ্ধির মুখে তিনি ১৯৭২ সালের ১ মে নিম্ন বেতনভুক্ত এসব কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন।

৮। শহীদ পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আর্থিক সাহায্য প্রদান: মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন ৩০ লক্ষ শহিদ পরিবারকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পত্র লিখে সমবেদনা জ্ঞাপন ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি ৩০ লক্ষ শহিদের স্মরণে 'জাতীয় শোক দিবস' পালন করা হয়।

৯। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন: ১৯৭১ সালে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ হারান এবং যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন বঙ্গবন্ধু তাঁদের মধ্যে ৭ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর শ্রেষ্ঠ', ৬৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর উত্তম', ১৭৫ জনকে বীরবিক্রম এবং ৪২৬ জনকে 'বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন।

১০। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ: যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনেও বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সকল ছাত্রছাত্রীকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ঘোষণা প্রদান করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১১। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদেরকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দান: বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫,৫৯৪ জন শিক্ষককে ১৯৭৩ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এটি ছিল যুগান্তকারী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

১২। মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারণ: ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যগণের বেতন মাসে এক হাজার টাকা নির্ধারণ করে দেন।

১৩। সেনাবাহিনী পুনর্গঠন: ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু সম্মিলিত বাহিনীর পরিবর্তে পৃথকভাবে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সৃষ্টি করেন।

১৪। গণমুখী শিক্ষা ও শিক্ষা কমিশন গঠন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়া। এজন্য প্রয়োজন ছিল সোনার মানুষ। প্রয়োজন ছিল দেশের শিক্ষাদানযোগ্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ন্যূনপক্ষে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। এজন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

গণমুখী শিক্ষা সম্পর্কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। সবার জন্য শিক্ষা ব্যতীত আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির যে কোনো উপায় নেই তা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন।

১৬। পাকিস্তানে আটকেপড়া পরিবারগুলোকে মাসিক ভাতা প্রদান: পাকিস্তানে আটক পরিবারগুলোর অবর্ণনীয় দুর্দশা বঙ্গবন্ধুকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি ১৯৭২ সালের ১৫ জুলাই তাদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদানের ঘোষণা দেন। ১৯৭২ সালের ১৪ অক্টোবর পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট তিনি বার্তা প্রেরণ করেন। ১৫ অক্টোবর তিন আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির নিকট পাকিস্তান হতে বাঙালিদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর পাকিস্তান ১০ হাজার বাঙালিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে সম্মত হয়।

১৭। সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত হয়।

১৮। শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দালাল রাজাকার, আল শামস ও আলবদররা অনেক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। ১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় দ্রুত এর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলে।

১৯। ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল। তাঁদের অনেকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল, অনেকেই আহত হয়েছিল। পৃথিবীতে কোনো স্বাধীন দেশেই এত তাড়াতাড়ি সাহায্যকারী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সেদেশ ত্যাগ করে না। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে ১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে। অথচ সে সময় দেশে-বিদেশে অনেকেই আশঙ্কা করেছিল যে, এত সহজে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করবে না

২০। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সাফল্য: এক রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক দেশটির নির্মাতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির আদি স্থপতি। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পূর্বেই জেনেভা, ভিয়েনা, লন্ডন, রোম, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডি.সি-তে অবস্থিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সবগুলো সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। দেশে-বিদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুউচ্চ ইমেজ ও সুখ্যাতি এক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে। এজন্যই তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় যে, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' (Friendship to all and malice to none)। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বলেন যে, 'পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাই আমাদের বৈদেশিক নীতির মূলকথা। আমরা বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চাই।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ নীতিতে। এজন্যই ১৯৭২ সালের মে মাসে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, 'আমি কোনো ব্লকে নেই। প্রাচ্য ব্লকেও নয়, পাশ্চাত্য ব্লকেও নয়-আমি স্বাধীন নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী।'

২১। জোট নিরপেক্ষ নীতি: বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগ 'জোট নিরপেক্ষ নীতিতে' বিশ্বাসী ছিল। বিশেষ করে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' ১১-দফা কর্মসূচিতে জোট নিরপেক্ষ নীতি অন্তর্ভুক্ত হবার পর থেকে আওয়ামী লীগ এ নীতির প্রতি অকৃত্রিম সমর্থন প্রদান করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর মুজিব সরকার জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করে। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বভাবসিদ্ধ তেজোদীপ্ত কণ্ঠে উপস্থিত সকলের নিকট জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এবং কাজে ও কথায় এর নীতি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

২২। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয়মাসে দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জ্বালাও- পোড়াও কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ এক বিধ্বস্ত ভূ-খণ্ডে পরিণত হয়েছিল। দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, খাদ্য গুদাম, হাট-বাজার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। সারাদেশে ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু, ৩০০টি রেল সেতু, প্রায় ৭৫ কি.মি. রেল লাইনের সম্পূর্ণ অংশ এবং ২২০ কি.মি. রেল লাইনের আংশিক ক্ষতি, ১৫০টি বগি ও কয়েকটি রেল ইঞ্জিন, শত শত বাস-ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন, ৩০০০ মালবাহী নৌকা ও কার্গো জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মাইন পোতার কারণে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর অচল হয়ে পড়ে। বিমান বন্দরের রানওয়ে বিধ্বস্ত হয়। আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনের ট্রাঙ্ক ব্যবস্থা এবং টেলিফোন সংস্থার সকল নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলে। এসময় বিদ্যুৎ সাবস্টেশনগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অনেক স্থানে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, বিদ্যুৎপোল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও দেশের প্রায় ৪৩ লাখ বসতবাড়ি, ৯ শত কলেজ ভবন, ৬ হাজার হাইস্কুল ভবন, ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯ হাজার গ্রামের হাট-বাজার, প্রায় ৪৩ লাখ বসতবাড়ি এবং ৩ হাজার অফিস ভবন পুড়িয়ে ধ্বংস করে। তাদের দোসর বিহারী জনগণ এবং আলবদর-আল শামস ও রাজাকাররা সারাদেশে ব্যাপক লুটপাট ও জ্বালাও-পোড়াও সহ ধ্বংসাত্মক কাজ চালায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

যুদ্ধবিধস্ত দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতি দ্রুত নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন :

(১) পুনর্বাসন পদক্ষেপ: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাছাড়া দেশের ভিতরেও স্থান পরিবর্তন করে, লুকিয়ে থেকে অসংখ্য মানুষ জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। আওয়ামী লীগ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের, মুক্তিযোদ্ধা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘর পাকিস্তানি সেনা, বিহারী জনগণ ও রাজাকাররা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল, লুটপাট করেছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশের মাটিতে ফিরে এসে তাদের পুনর্বাসনে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেন। কপর্দকহীন সরকারকে এ কাজে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

২) অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ন্ত্রণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ দুর্বল। সরকারের হাতে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা বলতে কিছুই নেই। পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের পূর্বেই ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ লুটপাট করে এবং কাগজের নোট ও ব্যাংকের নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের জন্য নতুন মুদ্রা চালু করেন এবং বাংলাদেশের জন্য 'সাহায্যদাতা গোষ্ঠী' গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে বিদেশি সাহায্য লাভের চেষ্টা চালান। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর বিপুল পরিচিতি বৈদেশিক সাহায্য পেতে বিরাট ভূমিকা রাখে। বিদেশি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অকৃপণ হাতে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ করতে থাকে। এসব দ্রব্যসামগ্রী সময়মত সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে ১৯৭২ সালেই যুদ্ধবিধ্বস্ত এদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতে পারতো।

(৩) ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা পুনর্গঠন বা পুনর্নির্মাণ: বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রথমে একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় বিধ্বস্ত যোগযোগব্যবস্থা। হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদেশের বড় বড় সেতুগুলো পরাজয়ের পূর্বে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু অতি দ্রুত ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট পুনঃনির্মাণ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সোনাহাট রেল সেতু (ভূরুঙ্গামারী), তিস্তা রেল সেতু (রংপুর), ভৈরব ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে পুনঃনির্মাণ করেন। এছাড়াও অল্প সময়ের মধ্যে ৪৫৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি ফেরি, ১৮৫১টি রেলওয়ে ওয়াগন, ৬০৫টি রেলওয়ে স্টেশন ও ৩টি পুরনো বিমান চালু করে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগব্যবস্থা চালু করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সাহায্যে চট্টগ্রাম নৌ-বন্দরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পুঁতে রাখা মাইন অপসারণ করে এ বন্দরটিকে পুনঃচালু করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট বি.আর.টি.সি. কোচ-সার্ভিস চালু করা হয়। হানাদার বাহিনী ভৈরব রেলসেতুর ৩৫১ ফুট লম্বা ৭টি স্প্যানের প্রধান তিনটি স্প্যান ধ্বংস করেছিল। বঙ্গবন্ধু দ্রুত এ সেতুর পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। ভারত ও বাংলাদেশের প্রকৌশলীগণ রাতদিন ২৪ ঘণ্টা কাজ করে এ সেতুর কাজ সম্পন্ন করেন। ফলে সুদীর্ঘ ২২ মাস বন্ধ থাকার পর এই সেতুটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া সম্ভব হয়। উল্লেখ্য এটি ছিল ৩০০টি পুনঃনির্মিত সেতুর মধ্যে সর্বশেষটি।

(৪) আদমজী জুট মিল উদ্বোধন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন যে, সদ্য স্বাধীন এদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে উৎপাদনের হার বাড়াতে হবে। তাছাড়া আদমজী জুট মিলের শ্রমিকদের কাজে নিয়োগের বিষয়টিও বঙ্গবন্ধু খুব গুরুত্বের সাথে চিন্তা করছিলেন। ১৯৭১ সালে আদমজী জুট মিল পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্ধ থাকা ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত আদমজী জুট মিল পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সংস্কার কাজ শেষে এর উদ্বোধন করেন তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সরকার পাটশিল্পকেও জাতীয় ঘোষণা করে। এরপর আদমজী জুট মিলসহ ৬৭টি পাটকল পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

(৫) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা কমিশন গঠন: বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ'ও গঠন করেন। মন্ত্রিসভায় পেশের আগে সব নীতিবিষয়ক সুপারিশ ও পরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এই পরিষদের ওপর। এছাড়া পরিকল্পনা কমিশন যেসব নীতি সংক্রান্ত সুপারিশ পেশ করবে তাঁর অনুমোদন দিবে অর্থনৈতিক পরিষদ। এই লক্ষ্যে এজন্য একটি পরিকল্পনা কমিশনও গঠন করা হয়। কমিশন একটি পাঁচসালা (১৯৭৩-৭৮) পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা' ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রধান লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য হ্রাস করা। এজন্য তিনি কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা।

(৬) যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ: যমুনা নদী বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলকে মূল ভূ-খণ্ড থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ম্যানিফেস্টোতে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ১ জুলাই অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও যোগাযোগমন্ত্রী এম. মনসুর আলী বাজেট-উত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে জাপান সরকার সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে বঙ্গবন্ধুর জাপানে রাষ্ট্রীয় সফরের সময় সেদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সাথে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শেষে এবং এ সম্পর্কে যুক্ত ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়। ১৯৮৮ সালে যমুনা সেতুর কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠন করলে অতি দ্রুত সেতু নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলে। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই স্বপ্নের সেতু উদ্বোধন করেন এবং এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু'। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সাথে দেশের সব অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটে।

(৭) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে আত্মসমর্পণের আগে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনগুলোর ট্রাঙ্ক ব্যবস্থা বিনষ্ট করে ফেলে, টেলিফোন সংস্থার নথিপত্র আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। বঙ্গবন্ধু টেলি যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ৫৫ হাজার টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার রাঙামাটি বেতবুনিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেন। ১৮ মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর 'রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকার (কানাডা) তত্ত্বাবধানে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন 'বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন। এর ফলে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগব্যবস্থার বিশেষ করে সরাসরি টেলিফোন ও টেলিকম ডায়ালিং ব্যবস্থা স্থাপিত হয়।

(৮) বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন: একাত্তর সালে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ সাবস্টেশন, বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন এবং বিদ্যুৎ খুঁটিগুলো বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালের মধ্যেই ৫০০০ বিদ্যুৎপোল এবং ১৫০০ কি.মি. বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করেন। ১৯৭২ সালে সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য 'পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' (PDB) গঠন করেন।

২৩। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন বছর এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর শাসনকাল ছোট হলেও তিনি দেশের জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এগুলো নিম্নরূপ:

(১) পরিকল্পনা কমিশন গঠন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৯৭৩ সালে এদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রণয়ন করে।

(২) পরিসংখ্যান ব্যুরো: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহের উপর গবেষণা এবং এজন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, আদমশুমারি, কৃষি শুমারি, শিল্প-কলকারখানা শুমারি, পারিবারিক আয়-ব্যয় জরিপ ইত্যাদি পরিচালনার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩) ন্যাশনাল পে কমিশন গঠন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালে 'ন্যাশনাল পে কমিশন' গঠন করে। স্থানীয় সরকারসহ বেসামরিক প্রশাসন পুনর্গঠন এবং একটি বেতন কাঠামো সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু এই 'পে কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশন সরকারি চাকরিজীবীদের ১০টি গ্রেডে বিন্যাস করে সুপারিশ করে।

(৪) প্রশাসন ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি গঠন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধিশালী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে। তাঁর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় বিরাজমান প্রশাসনিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধন করা। প্রশাসনিক কাঠামো এবং সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে সরকারের নীতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীকে প্রধান করে পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য, সংস্থাপন সচিব এবং প্রধানমন্ত্রী মনোনীত তিন জন সদস্য সমন্বয়ে 'প্রশাসন ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৭৩ সালের এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে দুই কিস্তিতে তাদের সুপারিশমালা জমা দেয়।

(৫) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন: সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে লোক নিয়োগের জন্য একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৩৪ নং আদেশবলে 'বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (প্রথম)' এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (দ্বিতীয়)' দুটি পৃথক সাংবিধানিক সংস্থা গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এ দুটি কমিশনকে একীভূত করে 'বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন' গঠিত হয়। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ (ন্যূনতম ৬ এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন) প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদে নির্বাচিত ও নিযুক্ত হন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দান, সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা গ্রহণ এবং তাদের চাকরির শর্তাবলি, পদোন্নতির নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মূল কাজ।

(৬) সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন ও মিলিটারি একাডেমি স্থাপন: ১৯৭১ সালের নয় মাসে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্রবাহিনীকে আধুনিক ও উন্নত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৯৭২ সালের ৬ মার্চ বাংলাদেশ রাইফেলস' (বি.ডি.আর) গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর সরকার পদাতিক বাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে অধ্যাদেশ জারি করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য থেকে বিমান বাহিনীর জন্য হেলিকপ্টার, যুগোশ্লাভিয়া থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র, মিসর থেকে সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাংক এবং ভারতের নিকট থেকে সেনাবাহিনীর জন্য যন্ত্রপাতি ও পোশাক ক্রয় করেন। উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রেরণ করেন।

সামরিক বাহিনীকে উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় একটি মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য বঙ্গবন্ধুর চেষ্টায় কুমিল্লার ময়নামতিতে 'মিলিটারি একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে যেদিন তিনি বলেন যে, "তোমরা জনগণের সৈন্য, তোমরা জাতীয় সেনাবাহিনী, তোমরা ভাড়াটে সেনাবাহিনী নও।' তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশপ্রেম ও ত্যাগের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখবে। জাতির স্বার্থে এই সেনাবাহিনী কঠোর নিষ্ঠা ও সুশৃঙ্খল কর্মের দ্বারা দেশকে সত্যিকারের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে তারা সচেষ্ট হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

(৭) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্যুৎ, যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ৫০০০ বিদ্যুৎ পোল আমদানি এবং ১৫০০ কি.মি. বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের দায়িত্ব পালনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড' (PDB) গঠন করেন।

(৮) বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন গঠন: দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের অসংখ্য ঘরবাড়িপাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধ্বংস করেছিল। মানুষের হাতে বাড়িঘর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ও পৌর এলাকায় বাড়িঘর নির্মাণের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে 'রাষ্ট্রপতির ৭নং আদেশবলে' হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন গঠন করেন।

(৯) বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা গঠন: যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে শিল্প-কলকারখানা স্থাপন এবং ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর 'রাষ্ট্রপতির আদেশ-১২৮ বলে' বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

(১০) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন: আন্তর্জাতিক রুটগুলোতে নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে শিপিং সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন' গঠন করেন। প্রাথমিকভাবে কাজ পরিচালনার জন্য কর্পোরেশনকে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কর্পোরেশনকে শিপিংয়ের সাথে জড়িত আনুষঙ্গিক সকল কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয় শিপিং কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য একটি ডিরেক্টর বোর্ডও গঠন করা হয়।

(৯) বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা গঠন: যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে শিল্প-কলকারখানা স্থাপন এবং ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর 'রাষ্ট্রপতির আদেশ-১২৮ বলে' বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

(১০) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন: আন্তর্জাতিক রুটগুলোতে নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে শিপিং সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন' গঠন করেন। প্রাথমিকভাবে কাজ পরিচালনার জন্য কর্পোরেশনকে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কর্পোরেশনকে শিপিংয়ের সাথে জড়িত আনুষঙ্গিক সকল কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয় শিপিং কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য একটি ডিরেক্টর বোর্ডও গঠন করা হয়।

(১১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ গঠন: কৃষিভিত্তিক গবেষণা কর্মসূচি অনুমোদন ও বাজেট বরাদ্দ করা, জাতীয় কৃষি গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৃষি স্নাতকদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করে।

(১২) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি ইনস্টিটিউট: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৩ সালে আণবিক বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিজ শস্যের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন ফসলের ওপর সারের প্রয়োগমাত্রা নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে।

(১৩) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল: আইনজীবীদের তালিকাভুক্তি এবং এজন্য পরীক্ষা গ্রহণ, অসদাচারণের জন্য নিবন্ধন বাতিল প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে 'বাংলাদেশ বার কাউন্সিল' নামে আইনজীবীদের সর্বোচ্চ সংগঠন। আইনজীবীদের এই সর্বোচ্চ সংগঠন গঠিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে। তিনি ১৯৭২ সালে 'রাষ্ট্রপতির ৪৬ নং আদেশবলে' বাংলাদেশ বার কাউন্সিল গঠন করেন।

(১৪) 'বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড' গঠন: স্বাধীন বাংলাদেশে কাঁচা তুলার সরবরাহ বন্ধ হবার জন্য বস্ত্রশিল্প মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। এ কারণে তুলার চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তুলা শিল্পকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর 'তুলা উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করেন। ১৮ ডিসেম্বর এই বোর্ড কার্যক্রম শুরু করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৫। সংবিধান রচনা: ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে দেশে ফেরার পর কালবিলম্ব না করে সংবিধান প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' এবং ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। তিনি ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন এবং ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করেন। এ কমিটি ১৭ এপ্রিল প্রথম বৈঠকে বসে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর করা হয়। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে একটি স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান রচনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। এজন্য তিনি দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হন। একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে তিনি ইচ্ছে করলে এত দ্রুত সংবিধান প্রণয়ন না করে 'বিপ্লবী সরকার' বা 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' নাম দিয়ে শাসন কাজ চালাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কেননা আজীবন তিনি গণতন্ত্র, নিয়মতন্ত্র ও সংবিধানের প্রাধান্যের জন্য আন্দোলন করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে জেল-জুলুম-নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করেছিলেন।

১৬। ভূমি সংস্কার: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত সমস্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। যাদের ১০০ বিঘার বেশি জমি আছে সেই বেশি জমি এবং নতুন জেগে ওঠা চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার বিধান করা হয়। গ্রাম বাংলার ঋণ জর্জরিত কৃষকদের ঋণ মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ সরকার 'খাই খালাসী আইন পাস করে। এ আইন প্রণয়নের ফলে হাজার হাজার দরিদ্র কৃষক জোতদারের নিকট থেকে তাদের জমি ফেরত পায়। এ 'খালাসী আইনে নিয়ম করা হয় যে, যদি কেউ বন্ধকী ও চুক্তি কবলা জমি ৭ বছর ভোগ করে তাহলে তার পরের বছর থেকে সেই জমি মূল মালিক অর্থাৎ বন্ধকদাতা ফেরত পাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৭। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান: আওয়ামী লীগ ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন। ব্যক্তিগতভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে মূল্যায়ন করা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করাকে তিনি বরাবরই ঘৃণা করতেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটানোর জন্য তিনি তাই রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সংযোজন করেন যা বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সমাদৃত হয়।

১৮। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন: ১৯৭২ সালের ২২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু সরকার 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করে।

১৯। বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি: জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। ফলে বিশ্বে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক News Week জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁকে 'Poet of Politics' অর্থাৎ 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিল। বাঙালির জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ এ কাব্য হলো আমাদের স্বাধীন মাতৃভূমি। স্বাধীন বাঙালি জাতির এ কাব্য রচনার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের পূর্বপুরুষদের হাজার বছরের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন- অনুজ্জ্বল অতীতকে প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দিয়েছেন। বাঙালির হাজার বছরের সাধনার সফল রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, সকলের প্রিয় 'বঙ্গবন্ধু'।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ১০ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।ফারায়েজি আন্দোলনের প্রবক্তা, প্রচারক, সংগঠক ও নেতা কে ছিলেন?
(ঢা. বো. ২০২১, ২০১৭; কু. বো. ২০১৬;
ক. নবাব আব্দুল লতিফ খ. শাহ্ ওয়ালীউল্ল্যা
গ. হাজী শরীয়তুল্লাহ ঘ. তিতুমীর

২।ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে কার নাম জড়িত? [চ. বো. ২০১৯]
ক. নবাব আব্দুল লতিফ খ. শাহ ওয়ালীউল্ল্যা
গ. হাজী শরীয়তুল্লাহ ঘ. সৈয়দ আমীর আলী

৩।হাজী শরীয়তুল্লাহ্ কত সালে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৭৬১ সালে মাদারীপুরে খ. ১৭৭১ সালে গোপালগঞ্জে
গ. ১৭৮১ সালে শরীয়তপুরে ঘ. ১৮৮১ সালে ফরিদপুরে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

মনোযোগসহকারে নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. আরিফ একজন খাঁটি মুসলমান ও সমাজ সংস্কারক। তিনি তার ধর্মের মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে একটি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি ভারতবর্ষকে কুসংস্কারে আচ্ছাদিত রাজ্য বলেও আখ্যায়িত করেছিলেন। [কু. বো. ২০২২]

৪।উদ্দীপকে মি. আরিফের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন্ নেতার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে?

ক. হাজী শরীয়ত উল্লাহ　　খ. শহিদ তিতুমীর

গ. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী　　ঘ. মওলানা মোহাম্মদ আলী

৫।ফরায়েজি কথাটি কোন্ শব্দ থেকে এসেছে? [ঢা. বো. ২০২৩]

ক. ফারায়েজ　　খ. ফজর　　গ. ফরাজ　　ঘ. ফরজ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন এ দেশকে কী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন?

ক. দারুল আমান　　খ. দারুল ইসলাম

গ. দারুল হারব　　ঘ. দারুল ফারায়েজ

৭।হাজী শরীয়তুল্লাহর মতে ইংরেজ রাজত্বে- [দি. বো. ২০১৯]

i. ইসলামি অনুশাসন মেনে চলা অসম্ভব

ii. সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপন অসম্ভব

iii. স্বাধীনভাবে ধর্মীয় সংস্কৃতি পালন অসম্ভব

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii　　গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব জহির উদ্দীন একজন ধার্মিক ও সংস্কারমূলক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি এমন একটি সমাজের কল্পনা করেন, যেখানে মানুষ কুসংস্কার মুক্ত হয়ে ধর্মের অবশ্য পালনীয় ফরজ কাজগুলো করবে। এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন।

[কু. বো. ২০১৯]

৮।উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব জহির উদ্দীনের আন্দোলনের সাথে কোন্ আন্দোলনের মিল রয়েছে?

ক. সিপাহী বিদ্রোহ　　খ. ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ

গ. অসহযোগ আন্দোলন　　ঘ. ফরায়েজি আন্দোলন

৯।উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আন্দোলনটি-

i. ব্রিটিশ ভারতে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন

ii. ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন

iii. খিলাফত আন্দোলনের সূচনা

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. I　　খ. Ii　　গ. Iii　　ঘ. i ও ii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১০। ফরায়েজি আন্দোলন মুসলমানদের মনে কী জাগ্রত করে?

ক. হিংসা খ. দায়িত্বশীলতা গ. আত্মবিশ্বাস ঘ. মমত্ববোধ

১১। ফরায়েজি আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল- [সি. বো. ২০১৭]

ক. মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসন মানতে অনুপ্রাণিত করা

খ. মুসলমানদেরকে ফরয পালনে আগ্রহী করে তোলা

গ. অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা

ঘ. সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করা

১২। ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য কী ছিল?

ক. ইসলাম ধর্ম প্রচার খ. প্রচলিত কুসংস্কার দূর

গ. মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি ঘ. মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তি

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১৩।তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী? [য. বো. ২০১৯]

ক. সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী　　খ. শাহ ওয়ালীউল্ল্যা

গ. হাজী শরীয়তুল্লাহ্　　ঘ. সৈয়দ মীর নিসার আলী

১৪। নিচের কোন্ ঘটনাটির সাথে তিতুমীরের সম্পৃক্ততা রয়েছে? [য. বো. ২০১৯]

ক. সিপাহী বিদ্রোহ　　খ. বারাসাত বিদ্রোহ

গ. ফরায়েজি আন্দোলন　　ঘ. কৃষক বিদ্রোহ

১৫।ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ কে?　চ. বো. ২০২৩]

ক. তিতুমীর　　খ. হাজী শরীয়তউল্লাহ

গ. নবাব আব্দুল লতিফ　　ঘ. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

টপিক – ১১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

- জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব এনামুল হক ব্যথিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিঋণ আইন, মহাজনী ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। [ঢা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন?

খ. লাহোর প্রস্তাব কেন উত্থাপন করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব এনামুল হকের সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত ব্যক্তিত্ব আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন- বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

আব্দুল হালিম ও মোঃ সাইফুল্লাহ একটি অবহেলিত পিছিয়ে পড়া, দুর্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায়ের বাসিন্দা। শিক্ষানুরাগ ও পাণ্ডিত্যের জন্য সরকার আব্দুল হালিমকে আইন পরিষদের সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সদস্য নিয়োগ করে। সরকারের আনুকূল্য কাজে লাগিয়ে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষা সংস্কারমূলক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মোঃ সাইফুল্লাহ নবাব পরিবারের সন্তান হয়েও নিজ সম্প্রদায়কে শিক্ষিত সচেতন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন। [কু. বো. ২০২২]

প্রশ্ন :

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?

খ. বারাসাত বিদ্রোহ কী?

গ. আব্দুল হালিমের সাথে তোমার পঠিত যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মিল রয়েছে তাঁর অবদান ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মোঃ সাইফুল্লাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির রাজনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান মূল্যায়ন করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'X' একজন রাজনৈতিক নেতা। মানুষের সেবাই তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য। তিনি সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে মানবপ্রেমে বিশ্বাস করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মের ব্যবহারকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বের মাধ্যমেই একটি স্বাধীন জাতির জন্ম হয়।

[রা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন :

ক. 'কৃষক-প্রজা পার্টি' কে প্রতিষ্ঠা করেন?

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকের 'X' এর সাথে তোমার পঠিত কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত নেতাই বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত প্রতিষ্ঠা করেছেন- বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU